খুলনায় ভাষা আন্দোলন

আটচল্লিশ
ও
বায়ান্ন

আবদুল হালিম

আট চল্লিশের ভাষা আন্দোলনে খুলনা

—আবদুল হালিম

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই পূর্ব বাংলার যুব সমাজ তাদের সম্বিত ফিরে পেল। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিন্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান, জান্‌দে লেঙ্গে পাকিস্তান, প্রভৃতি যুদ্ধংদেহী শ্লোগান আবেগময়ী আবেদন যেন কয়েক দিনের মধ্যেই থিতিয়ে গেল। ইতিপূর্বে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর ডঃ জিয়া উদ্দিন আহমদের ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ২৯শে জুলাই তারিখে দৈনিক আজাদে একটি প্রবন্ধ লিখে বাংলা-ভাষার দাবীর পক্ষে যুক্তিপূর্ণ দাবী রাখেন। কিন্তু এ সময় দেশের যুব সমাজ পাকিস্তানের মোহে এতই বিভোর ছিলেন যে, তারা ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র ঐ দাবী সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা বা কোন উচ্যবাচ্য করেন নি। পাকিস্তান ঘোষণার পর পরই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতীয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট থেকে তাদের প্রাপ্য বুঝে না নিয়েই দৌড়ে এলেন ঢাকায়। এখানে এসেই তারা তাদের গদি সংরক্ষিত ও আখের গুছাতে ব্যস্ত থাকলেন। ঢাকায় তখন খাজা গজাদের একচেটিয়া আধিপত্য। বাংলার যুব সমাজ নেতৃবর্গের কথায় ও কাজের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবল দেখতে পেলেন হিন্দু দারোগার লাঠি তুলে নিচ্ছেন মুসলমান দারোগা। হিন্দু নায়েবের

যায়গায় মুসলমান তহ্শীলদার এবং হিন্দু ব্যবসায়ীর জায়গায় অবাঙ্গালী ব্যবসাদার। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এমত অবস্থায় পাকিস্তান সৃষ্টির ৭ মাস ৭ দিনের দিন ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি জাতির জনক গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ স্বশরীরে ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ফরমান জারী করলেন, উর্দ্দু এবং উর্দ্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবেও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। সেদিন এ ঘোষণার প্রতিবাদে যে গুটি কয়েকজন ছাত্র 'নো' 'নো' করে সভা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, তারাই হলো ভাষা আন্দোলন তথা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্র-সেনানী। সেদিনের সেই সরব প্রতিবাদই ঐতিহাসিক বদরুদ্দিন ওমরের ভাষায় 'বাঙ্গালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের' যাত্রা শুরু।

সে দিনের সেই সব প্রতিবাদী কন্ঠ যদিও আজ ইতিহাসের গবেষণাগারে তবুও কি আমরা তাদের ভুলতে পারি ? কিন্তু ভুলতে বসেছি আমাদের সেই সব পূর্বসুরীদের, যারা খুলনাতেও সেদিন ছিলেন আন্দোলনের অগ্রদূত। ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব বিস্তর। রেডিও ছাড়া কোন সংবাদ মাধ্যম নাই। নদীপথে খুলনা বরিশাল কিংবা গোয়ালন্দ নারায়ণগঞ্জ হয়ে ২৪ ঘন্টা, রেলপথে সিরাজগঞ্জ জগন্নাথগঞ্জ হয়েও একই দূরত্ব। ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ তখনও চালু হয় নাই। ঢাকা থেকে কাগজ আসে দেড় দিন পর কিন্তু কলকাতার কাগজ আসে দুপুরের মধ্যেই। তখনও খুলনা-শিয়ালদাহ রেল চালু আছে পুরোপুরি।

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে এ প্রতিবাদের কোন সংবাদ প্রচার করেনি। কলকাতার কাগজে জাতির জনকের উক্তির প্রতিবাদের খবর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ছাত্র সমাজও তৎপর হয়ে উঠেন কিন্তু সেদিনের ছাত্রসমাজ বলতে মুসলিম ছাত্র লীগের প্রগতিশীল কর্মী ও ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন কর্মী। বৃহৎ কর্মীবাহিনী সম্বলিত কংগ্রেস পার্টির কর্মীরা সব নীরব। তাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে গিয়েছেন এবং বাকীরা যাওয়ার মুখোমুখী। তা'ছাড়া মফঃস্বল শহরগুলিতে পাকিস্তানের মোহ তখনও তুঙ্গে। পাকিস্তান তথা তার জনকের বিরুদ্ধে মুখ খোলে কার সাধ্যি! এ অবস্থার মধ্যে যে কয়জন এগিয়ে আসেন তারা হলেন ছাত্র ফেডারেশনের নেতা স্বদেশ বোস, সন্তোষ দাসগুপ্ত, ধনঞ্জয় দাস, আনোয়ার হোসেন ও মুসলিম ছাত্র লীগের তাহমীদউদ্দিন আহম্মদ, জিল্লুর রহমান, মতিয়ার রহমানসহ আরও কয়েকজন। মূল নেতৃত্ব দিয়াছিলেন স্বদেশ বোস, সন্তোষ দাসগুপ্ত, তাহমীদ উদ্দিন ও জিল্লুর রহমান। তখনকার খুলনার একমাত্র কলেজ দৌলতপুর কলেজে বসেই তারা ঠিক করেন খুলনাতেও বাংলা ভাষার স্বপক্ষে মিটিং করার। কলেজে বসে সিদ্ধান্ত নিলেও খুলনায় এসে এখানকার প্রতিষ্ঠিত ছাত্রনেতা মমিন উদ্দিন আহমেদ, এস, এম, আমজাদ হোসেন কাউকে দলে নিতে পারলেন না। স্বদেশ বোস, সন্তোষ দাস গুপ্ত, প্রথম কাতারের ছাত্রনেতা হলেও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানের ও তার নেতাদের বিপক্ষে কিছু বলা বা করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এবার ছাত্ররা নেতাদের সহযোগী কামনা করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু সেখানেও কেউ সাড়া দিলেন না। তখন সবাই মিলে খুলনার এম, এল. এ, আবদুস সবুর খানের কাছে যান। সবুর সাহেবর অবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক এবং মানসিক অবস্থা দোদুল্যমান। ১৯৪৭ সালের

জুন মাসে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষণার পর তৎকালীন বাংলার রাজধানী কলকাতা বসেই পূর্ব বাংলায় নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য মুসলিম লীগ পার্লিয়ামেন্টারী পার্টির যে মিটিং হয় তাতে তিনি ছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের দলে কিন্তু নেতা নির্বাচিত হলেন খাজা নাজিম উদ্দিন। সেই হেতু ঢাকাতে এসেও খাজা নাজিম উদ্দিন-সহ মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলনা আকরাম খান, সাধারণ সম্পাদক মোহন মিয়া, হামিদুল হক চৌধুরী দিগর কেউ তাকে দেখতে পারেন না। এদিকে খুলনার মুসলিম লীগেও তিনি অনুরূপ ভাবে কোণ ঠাসা অবস্থায়। সেখানে সৈয়েদ মোস্তা গাউছুল হক, আবদুল হক চৌধুরী, আবদুল হামিদ, দেলদার আহম্মদ, এ, এফ, এম, আবদুল জলিল, আলী হাফেজ, নকিব উদ্দিন সরদার দিগর পার্টি কবজা করে রেখেছেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তখনও পাকিস্তানে আসেন নাই। এ হেন দোদুল্যমান অবস্থায় আবদুস সবুর খান ছাত্রদের কথা দিলেন, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীর পক্ষে তাঁর সব রকম সাহায্য সহানুভূতি আছে ও থাকবে। সবুর সাহেবের সহানুভূতি পেয়ে ছাত্ররা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তারা জিন্নাহ্‌ সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী করার দাবী সম্বলিত অর্দ্ধ পৃষ্ঠার একখানা ইস্তাহারও ছেপে ফেল্‌লো। সেখানে ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও সবুর সাহেবের নাম ছাপা হল। পরদিন গান্ধী পার্কে (বর্তমান হাদিস পার্ক) প্রতিবাদ সভা। মিটিং-এর প্রচারের জন্য ছাত্ররা সব টিনের চোঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। (সে সময় মাইকের এত প্রচলন হয়নি) এদিকে আন্দোলনকারীরা যত না তৎপর সরকার ততোধিক হুঁশিয়ার। কোন ক্রমেই পাকছার জমিনে হিন্দুর ভাষা বাংলার কোন রকম আবদার সহ্য করবেন না। দেশের কোথাও

যাতে কোনরূপ আন্দোলনের দানা বাঁধতে না পারে তন্মর্মে ঢাকা থেকে কড়া নির্দেশ পাঠানো হয়। খুলনার এস, পি, মহীউদ্দিন সাহেব বাছা বাছা কয়েকজন ছাত্র নেতাদের ডেকে বসলেন তার অফিসে। ছাত্রদের মধ্যে তাহ্‌মীদউদ্দিন, জিল্লুর রহমান, মমিনউদ্দিন আহম্মদ ও এস, এম, আমজাদ হোসেন এবং মুসলিম লীগের যুব নেতা আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস ও আফিল উদ্দিন প্রভৃতি উপস্থিত হলেন। হিন্দু ও কমুউনিষ্ট ছাত্রদের ইচ্ছা করেই ডাকা হয় নাই। মহীউদ্দিন সাহেব ছাত্রনেতাদের বুঝালেন, সদ্য স্বাধীন শিশু পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য হিন্দুরা বিশেষ করে কমুউনিষ্টরা এসব ধ্বংসাত্মক কাজে নেমেছে. ওরা তোমাদের ভুল বুঝাচ্ছে। তোমরা এসব পথ ছাড়। নরম গরম সব রকম কথা বল্লেন এবং গ্রেপ্তার করারও ভয় দেখালেন। তর্ক-বিতর্কের মাঝে ছাত্রনেতা জিল্লুর রহমান বললো—কমুউনিষ্টরা বাপকে বাপ ডাকে বলে আমরা কি বাপকে অন্য কিছু বলে ডাকবো? ছাত্ররা তাদের বক্তব্যে আরও প্রকাশ করলো, তারা একলা নয় সবুর সাহেবও তাদের সাথে আছেন। মহীউদ্দিন সাহেব ছাত্রদের এ দাবী অস্বীকার করে ওপাশে বসা ছাত্র-নেতাদের দিকে তাকালেন। তখন তারা এস, পি, সাহেবের কথায় সায় দিয়ে বললেন, ইস্তাহারে প্রকাশিত বক্তব্যে সবুর সাহেবের মত নাই। একথা শুনার পর ছাত্ররা হতবাক হয়ে পড়লেন। এস, পি, সাহেবের সাথে মিটিং শেষ করে তারা ছুটলেন সবুর সাহেবের বাড়ীতে এ কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য। কিন্তু তার বাসায় গিয়ে জানতে পারলেন, তিনি আগের রাত্রেই ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেছেন।

এ অবস্থায় ছাত্ররা সবাই মন মরা হয়ে পড়েন তবুও তারা জনসভার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। দৌলতপুর কলেজ থেকে ২০/২৫

জনের একদল ছাত্র পায়ে হেটে এসে মিটিংয়ে যোগ দেয় কিন্তু সাধারণ ছাত্র বা জনসাধারণ কেউ ভয়ে মিটিংয়ের কাছে আসে না, তারা সব রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। এমত অবস্থায় ছাত্ররা কোন রকমে সভা আরম্ভ করে এবং সভাপতির সামান্য বক্তৃতা এবং একটা লিখিত রেজুলেশন পড়ে সভা শেষ করে। (সভাপতির নাম সংগ্রহ করা যায়নি। রেজুলেশন পাঠ করে আনোয়ার হোসেন) কিন্তু তাতেও ছাত্র নেতারা রেহাই পেলো না। ঐ দিন সন্ধ্যায় আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আনোয়ার হোসেনের সেই প্রথম কারাবরণ। আনোয়ারকে গ্রেফতার করার পর এস, পি, মহীউদ্দিন সাহেব নিজেই তাকে ইন্টেরোগেশন করতে লাগেন, কিন্তু তর্কে পরাস্ত হয়ে বলেন, "তুমি কি জিন্নাহ্ সাহেবের চেয়ে বেশী বোঝ নাকি ?" তুখোড় ছাত্র নিবেদিত প্রাণ আনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "জিন্নাহ্ সাহেব জিন্নাহ্ সাহেবের মত বোঝেন আর আমি বুঝি আমার মত।" এ রকম প্রতিউত্তর পাওয়ার পর এস, পি, সাহেবের আর ধৈর্য্য থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুষি মারেন আনোয়ারের মুখে। আনোয়ার গরীব বিধবার একমাত্র সন্তান। কোনদিন মাথা নত করে নাই শত অত্যাচার, অবিচার আর অসত্যের কাছে এমন কি মৃত্যু ভয়েও না। তাই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো পুলিসের গুলিতে গৃহে বন্দী অবস্থায় ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে। মতিয়ার রহমান ছিল স্কুল ছাত্র। কুমিল্লা না কোথায় বাড়ী। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আলীম সাহেবের ভাই। কয়েকদিন পর ছাড়া পাওয়ার পর আলীম সাহেব তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। তারপর তার আর কেউ খোঁজ জানে না। তাহমীদ্উদ্দিন ছিলেন সাতক্ষীরার তালা থানার অধিবাসী। বর্তমানে সরকারের চাকুরীতে

উচ্চপদে আসীন আছেন। জিল্লুর রহমান কুষ্টিয়া বারের সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং বি, এন. পি, নেতা। রাজনীতিতে বর্তমান আছেন। স্বদেশ বোস ছিলেন তালা থানায় খলিশখালী গ্রামের। ধনঞ্জয় দাস খালিশপুরের। সরকার তাদের সবাইকে মাসের পর মাস ডিটেনশনে রাখে। পর পর কয়েক বৎসর হাজতে রাখার পর ছাড়া পেলে ভারতে চলে যাবার বণ্ড নিয়ে জেল থেকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পাওয়ার পর তারা ভারতে চলে যান, সেখানেও তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। ৪৮ শের ঐ ঘটনার পর খুলনায় ভাষা আন্দোলন থেমে পড়ে বেশ কিছুকাল।

———

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন খুলনা

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর মনে হলো সমস্ত কিছু নীরব হয়ে গেছে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এর শ্লোগান স্তিমিত হয়ে পড়লো। কিন্তু সরকারী পর্যায় ভাবনা চিন্তা চলল দ্রুত লয়ে। একবার যখন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠেছে তখন একে যে করেই হোক চাপা দিতে হবে। আতুরেই ধ্বংস করতে হবে এর দাবী। রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রে অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ রাতের আরামকে হারাম করে উঠে পড়ে লেগে গেলেন— বাংগালীদের পাকিস্তানী বানাতে। পাকিস্তান আর্মিতে চালু করে দেয়া হল রোমান হরফে উর্দ্দু লেখা, আর উর্দ্দুই হল সেনাবাহিনীর ভাষা, সেখানে বাংলার কোন স্থান নাই। সেনাবাহিনীতে বাংগালীর সংখ্যা একেতো কম তার উপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সদ্য রিক্রুটেড স্বল্প শিক্ষিত বাংগালী যুবকদের উচ্চ পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানীরা যেভাবে তালিম দিচ্ছে তাতেই সই। সেনাবাহিনীর কাজও তাতে চলছে ভালভাবে বিশেষ করে আর্মির সংক্ষিপ্ত রোমান হরফে লিখিত উর্দ্দু ভাষা বাঙ্গালী সিপাইরা অশিক্ষিত পাঞ্জাবী সিপাইদের চেয়ে দ্রুত শিখতে পারছে। পাঞ্জাবী অফিসারেরা তার জন্য বাঙ্গালীদের বাহ্‌বা দিতে কার্পণ্য করছে না। অসামরিক শাসন যন্ত্রে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তারা সামরিক বাহিনীর দেখাদেখি পূর্ব বাংলার রোমান হরফে

বাংলা লেখার প্রচলন করার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজও চালু করেন। রোমান হরফে বাংলা লিখে কয়েকখানা পুস্তিকাও ছেপে ফেলেন এবং অফিস আদালতে কিভাবে চালু করা যায়, তার চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে।

বাংলাভাষার দরদী বাঙ্গালী নেতারা ধরে নিয়ে.ছন রাষ্ট্রভাষা বাংলাতো হচ্ছে না তার পরিবর্তে যদি বাংলাকে দেশের একটি আঞ্চলিক জাতীয় ভাষা বা ন্যাশন্যাল ল্যাংগুয়েজ করা যায় সেটি মন্দের ভাল। ইতিমধ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কয়েকজন বাঙ্গালী কর্মকর্তারা (যার মধ্যে জাতীয় গণ পরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের নাম শোনা গিয়েছিল) উর্দ্দুকে নেগেটিভ উপায়ে ঠেকাবার জন্য গোপনে গোপনে আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করেন। তাদের বক্তব্যঃ এক—পাকিস্তান যখন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তখন ধর্মের ভাষা, কোরানের ভাষা আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত, দুই—পাঞ্জাবী, সিন্ধি বেলুচীদের চেয়ে বাঙ্গালীরা তাড়াতাড়ি আরবী শিখতে পারবে। তিন—আরবী সবার কাছে নূতন ভাষা সুতরাং সুবিধা অসুবিধা সবার কাছে সমান হবে ইত্যাদি। এ দাবীর পিছনে আরও অনেক যুক্তি ছিল কিন্তু বাস্তব ভিত্তি ছিল কি না সন্দেহ। এ দাবী ছিল 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' গোছের। কোত্থেকে এ দাবী উঠেছিল ঐ সময় তা না জানলেও কলেজে কলেজে ছাত্ররা মিটিং করে ঐ মর্মে রেজুলেশন করে পাঠিয়েছিল। রাজশাহী কলেজ থেকেও অনুরূপ রেজুলেশন করেছিলাম। এসব ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সালের প্রথমার্ধের ব্যাপার। ১৯৫০ সালে পাক ভারতের উভয় জায়গায় অনেকগুলি জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু মুসলমান নিহত হয়। তার জন্য সমস্ত দেশব্যাপী

আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং দেশবাসী সাম্প্রদায়িক চিন্তায় মোহাচ্ছন্ন থাকে। হিন্দুদের দেশ ত্যাগ, মুসলমানদের আগমন। এছাড়া দেশবাসীর আর কোন চিন্তা ছিল না। সুতরাং ভাষার দাবীও চাপা পড়ে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রবল প্রতাপশালী প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিণ্ডির জনসভায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দিন সর্ব্বোচ্চ পদ ত্যাগ করে প্রধান মন্ত্রী হলেন। খাজা সাহেবের ক্ষমতায় আসার পূর্ব থেকে বাংলা ভাষার পক্ষে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পুনরায় গুঞ্জন শুরু হয় এবং তার ক্ষমতায় আসার পর আন্দোলনের একটি নির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তার উত্তরসূরী কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা দিলেন—উর্দ্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা অন্য কোন ভাষা নয়। খাজা নাজিমউদ্দিনের প্রকাশ্য ঘোষণা ছাইচাপা আগুন উস্কে দিল। শুরু হল সক্রিয় আন্দোলন এবং চরমে পৌঁছে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

প্রধান মন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতার পর কয়েকদিন মিছিল, মিটিং ও ধর্মঘটের পর আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেট ল্যাংগুয়েজ কমিটি" ও মৌলানা ভাষানীর নেতৃত্বে "সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ" আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা দেশে বাংলাভাষার দাবীর পক্ষে হরতাল ও মিটিং করার আহবান জানায়। খুলনায় সে আবেদন পৌঁছায় কিন্তু তৎকালীন নেতৃবর্গ কেউ এগিয়ে আসেন না। জনাব এম, এ, গফুর তখন ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনের শুরুতে গৃহ

শিক্ষকতা আরম্ভ করেছেন। থাকেন মিউনিসিপ্যাল পানির ট্যাংকের বিপরীত দিকে যশোর রোড ও সারদা বাবু রোডের সংযোগ স্থলে কাঁচা ড্রেনের উপরে সেনহাটির শচীন সেনের জীর্ণ একতলা বাড়ীর একটি কামরায়। বাড়ীটি পরিত্যক্ত বললেও চলে। এখন সেখানে সৈয়দ সালাউদ্দিনের তিনতলা বাড়ী, রণজনা অফিস ইত্যাদি। তরুণ যুবক সাইদুর রহমান সাইদ ইউনাইটেড ক্লাব নামকরণে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ওখানে আসর বসিয়েছেন। গফুর সাহেবের নিজস্ব কোন জায়গা না থাকায় ক্লাবের সদস্যরা তাকে ওখানে থাকতে দিয়েছে। গফুর সাহেব আগে থেকেই প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোক। গল্প কবিতা লেখেন আর ছাত্র পড়ান। পাশের কামরায় এ, কে, সামসুদ্দিন ওঃ সুনু 'আজাদ গ্রন্থালয়' নামক একটি ছোট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে চালাচ্ছেন। সেখানে পাড়ার ছেলেরাতো বটে দু'চার জন বয়স্ক ব্যক্তিও বই, খবরের কাগজ পড়তে আসেন। সুনু মিয়ার ইতিমধ্যে এ পাড়ায় এবং অন্য পাড়ায় একজন সংগঠক বলে ও সংস্কৃতিসেবী বলে পরিচিত হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী পেয়ে এম, এ, গফুর, সুনু মিয়া ও তার ছাত্র তোফাজ্জেল হোসেনকে নিয়ে আলোচনায় বসে ভাবছিলেন কি করা যায়! ওরা দু'জন এক কথায় রাজী। ১৮ তারিখে এ তিন জনের আলোচনা। এমন সময় এম, এ, বারী এসে জোটেন। সেও রাজী। কর্মচঞ্চল এম, এ, বারী কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এই চারজন মিলে সাব্যস্ত করেন শহরব্যাপী পোস্টারিং করার ও স্কুল কলেজের ধর্মঘট করার জন্য। পোস্টার তৈয়ারীতে কাগজ চাই, কলম চাই, চাই লেখার লোক এবং এসব গোপন রাখতে হবে সরকারের নজর থেকে। ক্লাবে ছিল কয়েকখানা খবরের কাগজ, সুনু মিয়া যোগাড় করল আরও কয়েকখানা। দু'আনা দিয়ে আলতা কেনা হলো

এক শিশি, ঝাঁটার কাঠির মাথায় ন্যাকড়া পেঁচিয়ে তৈরী করল তুলি। তাই দিয়ে ওরা ১০০ খানার মত পোষ্টার লিখে ফেলল এবং ২০ তারিখের সন্ধ্যায় রাতের অন্ধকারে যশোর রোড, কে, ডি, ঘোষ রোড ও স্কুলগুলোর দেওয়ালে দেওয়ালে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিল। পর দিন ঐ চারজনসহ আরও কয়েকজন যার মধ্যে সমীর আহমেদও স্কুলে স্কুলে গিয়ে ক্লাস বর্জনের আহবান জানায়। বি, কে, মডেল ও সেন্ট যোসেফের ছেলেরা হরতাল করে ও মিছিলে যোগ দেয় কিন্তু জিলা স্কুলে কোন হরতাল হয় না। ওদিনের প্রোগ্রাম ওখানেই শেষ। স্কুলগুলোর কোনরকম সাড়া পেলেও বৃহৎ শহরবাসীর মনে বিশেষ কোন দাগ কাটেনি।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শোনা গেল ঢাকায় মিছিলের উপর গুলি হয়েছে এবং অনেক ছাত্র মারা গেছে। ঢাকা খুলনার একমাত্র যোগাযোগ পুলিস লাইনে রক্ষিত ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ঢাকার সরকারী কর্তৃপক্ষ ঢাকায় গুলি হওয়া ও কিছু ছাত্রের মৃতজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি উল্লেখ করে জেলা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়। ঐ সংবাদ ওয়্যারলেস অপারেটর তেরখাদার আঃ ছত্তার সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন এবং খুলনা শহরে দাবানলের মত এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পাওয়ার পর যুবনেতা আবু মহম্মদ ফেরদৌস, এস, এম, এ, জলিল ও নুরুল ইসলাম নূরো গফুর সাহেবের আস্তানায় হাজির হন এবং আন্দোলনে গফুর সাহেবের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসেন। ওদের দেখাদেখি দল ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে বিশেষ করে মুসলিম ছাত্র লীগ তথা মুসলিম লীগের একজন নাম-করা প্রতিষ্ঠিত কর্মী আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস এসে আন্দোলনের গতি অনেক সজীব করে দেয়। ওখানে বসে সিদ্ধান্ত নেয় আগামীকাল

বিকেলে প্রতিবাদ সভা, হরতাল ও মিছিল করতে হবে। এর জন্য যে সব প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন তাও করতে হবে। ঐদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী সিগারেট ও Condense milk এর ১০টা কৌটা যোগাড় করে কাগজ দিয়ে মুখ বন্ধ করে মিটিংয়ের খরচের জন্য রোড কালেকশনে বেরোয়। রাস্তায় দোকানে যেখানেই গেছে সেখানেই কেউ ফিরিয়ে দেয়নি। এক পয়সা, দু'পয়সা থেকে এক আনা, দু'আনাও দিয়েছে। ২ ঘন্টার মধ্যে কৌটা বোঝাই। সেদিন ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সমস্ত খুলনাবাসী। ঐ টাকা দিয়ে হেলাতলা মোড়ের ক্ষেত্র ঝালাই-কারের কাছ থেকে কেরোসিন টিনের 8টা চোঙ্গা কিনে লেগে যায় জনসভার প্রচারে। দিনভর প্রচার চালায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক দল পোস্টার লিখতে থাকে এবং দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে দেয়। পাকিস্তান হওয়ার পর ঐদিনই প্রথম দিনের বেলা প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী পোস্টার লাগানো হয়। এর পূর্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলা বা করা সম্ভব হয়নি। ঐদিন পুর্ণ হরতাল পালিত হয়। রিকশাচালক ও দোকানদারগণ তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখে। প্রায় দেড়দিন ধরে প্রচার চলে রাস্তায় ও বাজারে। পাড়ায় পাড়ায় একই আলোচনা—একি কাণ্ড! দিন দুপুরে গুলি করে হত্যা? এমন কাণ্ড কেউ শুনেছে? খুলনা শহর যেন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। এমন কি ছাত্ররা থানায় গেলে দারোগা, পুলিস যার পকেটে যা ছিল তাই চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। পরদিন ২৩ তারিখ বিকালে গান্ধী পার্কে ঐ চোঙ্গা দিয়েই জনসভা করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ওটাই ছিল ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম ও বৃহত্তম জনসভা। ঐ দিনকার মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন এম, এ, গফুর, বক্তৃতা করেন আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস, আলতাফ খান ও আরও

দু'এক জন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, ছাত্র হত্যার বিচার চাই ও নুরুল আমিনের পদত্যাগ চাই ইত্যাদি। গান্ধী পার্কের সফল জনসভার পর আরও অনেক কর্মী ও ছাত্রনেতা এগিয়ে আসে ও আন্দোলনকারীদের সাথে যোগ দেয়। এদের মধ্যে খন্দকার আবদুল হাফিজ, মিজানুর রহিম, জাহীদুল হক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খন্দকার আব্দুল হাফিজ মুসলিম লীগ নেতা এস, এম, এ, মজিদের ভাগ্নে এবং তার বাড়ীতে লালিত ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত "প্রবাহ" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে তাঁর মত ও পথের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। মিজানুর রহিম ও জাহিদুল হক ছিলেন ছাত্র এবং মার্কসীয় লাইনে সবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

ঐদিন রাত্রেই ঢাকা থেকে খবর আসে জেলায় ও মহকুমায় সর্বস্থানে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার ও আন্দোলন চালিয়ে যাবার। সংগ্রাম কমিটির নির্দেশ পাওয়ার পরে উপস্থিত কয়েকজন মিলে ২৫ তারিখ হরতাল ঘোষণা করে। প্রচার যথারীতি চলতে থাকে এবং পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুপুর বেলায় সাহিদুর রহমানের ইউনাইটেড ক্লাবের মধ্যে বসে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম কমিটিতে নিম্নলিখিত এগারো জনকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আরো ৫জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গঠিত সংগ্রাম কমিটির নাম ঃ এম, এ, গফুর (আহবায়ক) এবং সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে—আবু মহম্মদ ফেরদৌস, এস, এম, এ, জলিল, নুরুল ইসলাম নুরু, এম, এ, বারী,

এ. কে, সামসুদ্দীন (সুনু), আলতাফ হোসেন খান, খন্দকার আব্দুল হাফিজ, জাহিদুল হক, মিজানুর রহিম ও খন্দকার এনামুর রহমান।

২৫শে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্ব বাংলার মত খুলনা শহরে হরতাল পালিত হয় এবং বিকেলে গান্ধী পার্কে আর এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন খন্দকার হাফিজ। বক্তৃতা করেন এম, এ, গফুর, আবু মহম্মদ ফেরদৌস, আলতাফ খান ও এম, এ, বারী এবং প্রস্তাব পাঠ করেন এ, কে, সামসুদ্দীন। ২৫ তারিখের জনসভার ফলশ্রুতি হিসাবে শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দৌলতপুর কলেজ আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ছাত্র কর্মীগণ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে মফঃস্বল অঞ্চলের স্কুলে স্কুলে গিয়ে আন্দোলনের বক্তব্য পেশ করতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে ২৬ কি ২৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক প্রেরিত অন্যতম ছাত্র-নেতা কাজী নুরুল ইসলাম খুলনায় এসে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সাথে ঢাকার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর এক লোমহর্ষকর বর্ণনা দেন। উপস্থিত কর্মীবৃন্দ আবেগেমোহিত হয়ে পড়েন এবং আন্দোলনের সফলতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কাজী নুরুল ইসলামের উপস্থিতিতে কর্মীরা দ্বিগুন উৎসাহে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের গতিধারা সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলার সাথে পরিচালিত হতে থাকে।

কাজী নুরুল ইসলাম খুলনায় আসার পর সংগ্রাম কমিটিতে আরও ৫ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (তাদের নাম সংগ্রহ করা যায়নি)

এবং সংগ্রাম কমিটির আহবানে ২৮ তারিখে গান্ধী পার্কে আর একটি বৃহৎ জনসভা হয়, সভায় সভাপতিত্ব করেন কে, এ, হাফিজ। ঐদিনই খুলনার প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে কয়েকজন জনসভায় ভাষণ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন কাজী নুরুল ইসলাম, এম, এ, গফুর, আলতাফ খান প্রমুখ। ইতিমধ্যে খুলনার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও এগিয়ে আসেন এবং কেউ কেউ সংগ্রাম পরিষদের সাথে জনসভায় যোগ দেন ও বক্তব্যও রাখেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরিষদকে যারা সমস্ত রকম সহানুভূতি, পরামর্শ ও সাহায্য করেন তাঁরা হলেন— এ, এফ, এম, আবদুল জলিল, আবদুল জব্বার. এ, এইচ, দেলদার আহমদ ও গোলাম সাহিদ মোক্তার। এঁদের মধ্যে জনাব দেলদার আহমদ ও আব্দুল জব্বার সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন। কাজী নুরুল ইসলাম খুলনার ছাত্রদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে জনমত গঠন করার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং নিজেও বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন ও জনসভা করে সমস্ত জনতাকে আন্দোলনের সাথী করে তোলেন। খুলনা জেলায় তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ঐ সময় বহু ছাত্র ও কর্মী সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। তাদের সবার নাম এখন পাওয়া না গেলেও নুরুল ইসলাম নান্নু, মালিক আতাহার, সিরাজুল হক, আব্দুর রহিম প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সময় আন্দোলনের গতি এত বেগবান হয় যে, মাদ্রাসা ছাত্রদের আহুত ধর্মসভায় বক্তাগণ বাংলা ভাষার দাবীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন, এমনকি মাওলানা আব্দুল করিম খান ফারুকীর মত কট্টর পাকিস্তানী পন্থী ভাষার দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা করেন।

যত সহজে আন্দোলনের গতিধারা বর্ণনা করা হলো তাতে

সেদিনকার সামাজিক অবস্থা বোঝা যাবে না এবং আন্দোলনকারীদের সাথে আরও যে সমস্ত ব্যক্তি সহযোগিতা করেছিলেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে প্রবন্ধটি অপূর্ণ থাকবে বলে মনে করি। ঐ সময় ইসলামিক জোশে সৃষ্ট পাকিস্তান ও তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা যে কত কঠিন ছিল আজ আর তা উপলব্ধি করাও যাবে না এবং আন্দোলনকারীদের অভিভাবকেরাও ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের প্রথম দিকে যিনি সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন তিনি হলেন 'মডেল' স্কুলের শিক্ষক কাম কেরানী খন্দকার এনামুর রহমান ওরফে ইনাম মাস্টার। আন্দোলনের মূলঘাঁটি গফুর সাহেবের আস্থানার পাশের বাড়ীতে স্বপরিবারে বসবাস করেন। বাড়ী যশোর জেলায়। প্রথম জীবনে তিনি কৃষকপ্রজা পার্টির অন্যতম সংগঠক নেতা সৈয়দ নওশের আলীর সমর্থক ছিলেন। পরে পাকিস্তান আন্দোলনে পাকিস্তানের পক্ষে যশোর জেলার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তার মত একজন অভিজ্ঞ বৈষয়িক কর্মীর সক্রিয় সাহায্য পেয়ে কর্মীদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে তিনি ছিলেন প্রাথমিক অবস্থায় আন্দোলনের অলিখিত ট্রেজারার। পোস্টার লেখার সাজ-সরঞ্জাম-সহ আদায়কৃত টাকা পয়সা তাঁর বাড়ীতে জমা থাকতো এবং প্রয়োজনমত খরচ হত, এবং তাঁর বাড়ীতেই হতো কর্মীদের গোপন বৈঠক। সে সময় অভিভাবকেরা সবাই পাকিস্তানের নামে মাতোয়ারা। কর্মীরা আন্দোলনে ভীত ও সন্ত্রস্ত। সেখানে তিনি কর্মীদের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে উজ্জীবিত রেখেছিলেন। পরে ২৪ তারিখে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হন। বাইরে থেকে যিনি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন তিনি হলেন মুসলিম লীগের নেতা ও সাহিত্যিক এ, এফ, এম, আবদুল জলিল। তিনি সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে না

আসলেও সময়মত বুদ্ধি, পরামর্শ ও উৎসাহ জোগাতেন। সংগ্রাম কমিটির অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পরবতীতে এম, এ, বারী আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা এবং ১৯৭৩ সালে খুলনার এম, পি, এ, নির্বাচিত হন। নুরুল ইসলাম প্রথমে ন্যাপ ও পরে বি, এন, পি, এর নেতা এস, এম, এ, জলিল ও মিজানুর রহিম ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকুরী নিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। আবু মহম্মদ ফেরদৌস ও এ, কে, সামসুদ্দীন এখনও রাজনীতিতে মোজাফফর ন্যাপের নেতা হিসাবে খুলনার প্রতিটি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত আছেন। আলতাফ হোসেনের বাড়ী দৌলতপুরে, রাজনীতির সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। জাহিদুল হক ছিলেন দৌলতপুর কলেজের ছাত্র এবং জনৈক ইনকামট্যাক্স অফিসারের পুত্র। প্রথমে করাচীর ডন পত্রিকায় সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন, এখন গণচীনে সাংবা-দিকতা কাজে নিয়োজিত আছেন। খন্দকার আবদুল হাফিজ নড়াইলে ওকালতি শুরু করেন। সেখানকার আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও এম, এন, এ, ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিযোদ্ধা। খন্দকার এনামুর রহমান অনেকদিন 'মডেল' স্কুলে চাকুরী করেন ও পরে ঠিকাদারী আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি জীবন সংগ্রামে একজন পরাজিত সৈনিক। কাজী নূরুল ইসলাম এর বাড়ী মুজগুন্নি গ্রামে। বর্তমানে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সমীর আহমদ কলকাতার আদি বাসিন্দা। স্বপরিবারে খুলনায় আসেন, লেখাপড়া ও ব্যবসা একই সাথে চালাতেন। ভাষা আন্দোলনের কর্মীরা তাঁর ওখানে প্রায়ই আড্ডা দিত। এবং বিনা পয়সায় চা খেত, যার জন্য এক সময় বিশেষ মহল তাঁর দোকান কাম আড্ডাখানা পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। সমীর সাহেবের বাড়ীতে সবাই উর্দ্দুভাষী হলেও তিনি

পাকিস্তানের পর ১৯৫২ সালে খুলনা থেকে শিশুদের জন্য প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজ পত্র' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বের করেন। পর পর কয়েক সংখ্যা বের করার পর ভাষা আন্দোলনে তাঁর জড়িত থাকার জন্য সরকার ঐ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। খুলনায় প্রথম সাহিত্য পত্রিকা বের করার জনা তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমীর সাহেব স্কুলে ধর্মঘট করানো থেকে শুরু করে ঢাকা থেকে আগত মর্নিং নিউজ ও আজাদ পত্রিকা পোড়ানো পর্যন্ত সব রকম কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি খুলনা শহরের একজন ব্যবসায়ী।

৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এম, এ, গফুর। পাইকগাছা থানার হডেড গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান, কিন্তু খুলনায় ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত এমন কোন প্রগতিশীল আন্দোলন ছিলনা যেখানে তিনি কোননা কোনভাবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। গণতন্ত্রী দলের খুলনা জেলা শাখার প্রতিষ্ঠিতা সেক্রেটারী। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাপের জেলা সম্পাদক। ১৯৬২ সালের গঠিত পি, ডি, এম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিভ মুভমেন্ট) এর এবং ১৯৬৪ সালে গঠিত 'কপ' এর জেলা কমিটির অন্যতম আহবায়ক। ১৯৬৭ সালের ন্যাপ বিভক্তির পর মোজাফফর ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগে যোগদান এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে পাইকগাছা-আশাশুনি কেন্দ্র থেকে রেকর্ড ভোটে খান, এ, সবুরকে পরাজিত করে এম, এন, এ, নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ

থেকে শত্রু বিতাড়িত করায় সহায়তা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন অন্যান্য নেতারা শহরে বা রাজধানীতে মন্ত্রী হওয়ার জন্য বা নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত তখন তিনি নিজ এলাকার নোনাপানি ঠেকাতে বাঁধবন্দী করতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালের ৬ই জুন তারিখে শাহাপাড়া গ্রামের বাঁধের উপর বন্দুকধারীদের গুলিতে নৃশংসভাবে নিহত হন কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর বিচার পর্যন্ত হয়নি। আর তার সংগ্রামের স্বীকৃতি দিবে কে?

১৯৫২ সালের আন্দোলনের আরো কয়েকটি ঘটনাও সেদিন-কার খুলনার পরিবেশ ও পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ না করলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকবে বলে মনে করি।

৫২-এর আন্দোলনে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পোষ্টার লাগাবার জন্য এ, কে, সামসুদ্দীন এর বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক ফৌজদারী আদালতে এক মামলা দায়ের করে। ঐ মামলায় জামিন মুভ করার সময় খুলনা বারের অনেক উকিল—যথা আব্দুল জব্বার, এ, এফ, এম, আব্দুল জলিল এবং মোক্তারদের মধ্যে জনাব আব্দুল ওহাব গোলাম সাঈদ, মুনছুর আহ্‌মেদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ একযোগে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন ও জামিনে মুক্ত করেন। পরবর্তীতে ঐ মামলা ডিস্‌মিস্‌ হয়ে যায়। ঐ সময়ের আরেকটি ঘটনায় খুলনায় কংগ্রেস দলীয় এম, পি, এ, গোবিন্দ বাড়ুয্যেকে ২৩শে ফেব্রুয়ার তারিখে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে বহুদিন পর্যন্ত হাজতে আটক রাখে। দেলদার সাহেব তখন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর, জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডি, এম, কামরুল ইসলাম কৈফিয়ত তলব করার ভাষায় বলেন—আপনি সরকারী এ, পি, পি, হিসেবে জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন কিভাবে? দেলদার সাহেব সঙ্গে

সঙ্গে উত্তর দেন—'ইট্স মাই প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স। আই অ্যাম নট আনসারেবল টু মাই ক্লায়েন্ট। কামরুল ইসলাম পুনরায় বলেন,— ইউ শুড হ্যাভ রিজাইণ্ড বিফোর স্পিকিং। দেলদার সাহেবও কম যান না, উত্তর দেন—'আই হ্যাভ নট অ্যাপ্লায়েড ফর দি পোষ্ট, সো কোশ্চেন অব রেজিগনেশন ডাজ নট অ্যারাইজ। এই রকম ছিল সেদিনকার কর্মী ও নেতাদের মনোবল ও স্যাক্রিফাইসিং অ্যাটিচিউড।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দলের মধ্যে রেশারেশী পূর্বাপর চলতে থাকে এবং নুরুল আমিনের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দলাদলি চরমে পোঁছায়। সবুর সাহেব ও তাঁর দলের এস, এম, এ, মজিদ, হাজী মোজাহারউদ্দীন, মোক্তার নজীর আহমেদ মোক্তার নুরুল হক, অ্যাডভোকেট আমীর আলী খান, খান সাহেব, সুলতান আহমেদ প্রমুখ এক দিকে। অন্যদলে এ, এফ, এম, আব্দুল জলিল, আব্দুল হামিদ, দেলদার আহমেদ, মোস্তাগাউছল হক, আবু মহম্মদ ফেরদৌস প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। দ্বন্দ্ব চরমে পোঁছে ১৯৫০-৫১ সালের দিকে। সহজে কাজ না হলে সবুর সাহেব ডাণ্ডা দিয়ে ঠান্ডা করেন বিরুদ্ধবাদীদের। ইতিপূর্বে জলিল সাহেবের উপর কয়েকবার হামলা হয়েছে। ৫১ সালের শেষের দিকে কাজী পাড়ার মোড়ে আবু মহম্মদ ফেরদৌসকে হকিস্টিক দিয়ে মেরে রাস্তায় ফেলে রাখে। তিনি একমাস হসপিটালে থাকার পর রোগমুক্ত হন। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়া খুলনার মুসলিম লীগ বিভক্তি পুরোপুরি সম্পন্ন হল। জলিল সাহেব দেলদার সাহেব ভাষা আন্দোলনে সমর্থন করায়, সবুর সাহেব, নুরুল আমিনের আশির্বাদ লাভ করেন এবং দেলদার সাহেব, জলিল সাহেবরা আওয়ামী-মুসলিম লীগে যোগ দেন।

ভাষা আন্দোলনের গতিবেগ কমার সাথে সাথে মে/জুনের দিকে সবুর খান খুলনা মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সরকারের সাথে খুলনার ভাষা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। অবস্থা এমন এক পর্যায় পেঁৗছে যে, আন্দোলনকারীদের খুলনায় বসবাসই দায় হয়ে পড়ে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি কাঁঠালতলার নিকটে (যশোর রোডে পানির ট্যাঙ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে) এম, এ, গফুরকে মুসলিম লীগের গুন্ডাবাহিনী মারাত্মকভাবে যখম করে ফেলে রাখে। ১৮ দিন হসপিটালে থাকার পর সুস্থ হন। ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মসভার কাছ থেকে এ, কে, সামসুদ্দিনকে গুন্ডারা ধরে নিয়ে সবুর সাহেবের 'বিশ্রাম নিকেতনে' আটকিয়ে রাখে। কিন্তু সেখানে তার কয়েকজন আত্মীয় থাকায় সেযাত্রা মারের হাত থেকে রক্ষা পায়। দু'ঘন্টা পর তাকে খুলনা থানায় পাঠিয়ে দেয় এবং রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। অপর একদিন এম, এ, বারী ও সুনু মিঞাকে ভৈরব ষ্ট্র্যান্ড রোডে গুণ্ডারা হামলা করে। সুনু মিঞা পাড়ার অলি গলি দিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে আর বারী নৌকা করে ওপার হয়ে সন্ধ্যাবেলা নূতন-বাজার ঘাট হয়ে তার লজিংবাড়ী দেলদার সাহেবের বাড়ীতে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে সমিরের উপরও হামলা হয়েছে। এরকম শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা চলে ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। '৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর মিছিলের উপর মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ চালালে জনতা মারমুখী হয়ে কয়লাঘাটার সাউথ সেন্ট্রাল রোডে উল্টো আক্রমণ চালিয়ে ওদের পর্যুদস্ত করে। সেদিন থেকে মুসলিম লীগের গুন্ডামী কমতে থাকে।

ঐ সময় ভাষা আন্দোলনে বা অন্য বামপন্থী আন্দোলনে যারা সরকারের কোপানলে পড়ে আসামী হয়ে জেল হাজতে আসতেন, তাদের পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওকালতি করার জন্য যারা এগিয়ে আসেন, তাদের সাথে জনাব আব্দুল জব্বারের নাম সর্বাগ্রে, তারপর এ, এফ, এম, আব্দুল জলিল, আব্দুল হাকিম, এ, এইচ, দেলদার আহমদ, আব্দুল ওহাব ও গোলাম ছাইদ মোক্তার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তখন ঢাকায় পত্রিকা বলতে আজাদ ও মর্নিং নিউজ এবং ও দুটি পত্রিকা সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক। ভাষা আন্দোলনের খবরাখবর তারা খুব কমই ছাপাতো এবং খুলনার বসি খবর তো মোটেই না। তখন কলিকাতার প্রগতিশীল পত্রিকা দৈনিক সত্যযুগে খুলনার অনেক খবর প্রকাশিত হতো। তার কিছু নিম্নে দেওয়া গেল।

দৈনিক সত্যযুগ

কলিকাতা ৮ই মার্চ ১৯৫২

ঢাকায় অন্ততঃ ৩০ জন নিহত

খুলনা ২রা মার্চ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রনেতা মিঃ কাজী নূরুল ইসলাম খুলনায় এক জনসভায় বলিয়াছেন যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেজিষ্টার অনুসারে দুই দিনের পুলিসী জুলুমে অন্ততঃ ৩০ জন নিহত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঢাকায় যে বিয়োগান্ত নাটক হইয়া গিয়াছে, সংবাদপত্রে তাহার একাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দুপুর রাত্রে সৈন্যরা হাসপাতালের মর্গ হইতে মৃতদেহগুলি সরাইয়া চুপি চুপি কবর দিয়াছে।

অবিলম্বে নুরুল আমীন মন্ত্রী-সভার পদত্যাগ ও পুলিসী অত্যাচার সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৫ই মার্চ 'শহীদ দিবস' ঘোষণা করিয়া পূর্ণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে শহীদ দিবস

খুলনা শহীদ দিবস

খুলনা, ৬ই মার্চ—গতকল্য কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশানুযায়ী স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ কর্তৃক শহীদ দিবস পালন করা হয়। ঐদিন জিলার সমস্ত স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট এবং সর্বপ্রকার যানবাহন সম্পূর্ণ হরতাল পালন করে। বেলা তিন ঘটিকায় পার্ক হইতে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিয়া স্থানীয় পার্কের জনসভায় যোগদান করে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব হাফিজ সাহেব, জনাব দেলদার আহমেদ বি-এল, অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার, ছাত্রনেতা কাজী নুরুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরকারের দমন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম সাহেব সরকারের ভাওতা যে অযৌক্তিক তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পিছনে কোন কমিউনিস্ট অথবা রাষ্ট্রবিরোধী হস্ত ক্রিয়া করিতেছে কিনা. তাহা জনসাধারণের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইলেই বুঝা যাইত এবং তিনি আরও বলেন, বিশেষ করিয়া ছাত্র সমাজ রাষ্ট্র বিরোধী যে কোন কার্যকলাপকে ঘৃণা করে এবং ছাত্রসমাজ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকেই কঠোর হস্তে দমন করিতে প্রস্তুত আছে। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।... ... ...।

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ—

প্রকাশিত ঃ

মহানবীর দেশে

প্রকাশের পথে ঃ

- পুরাঘটিত বর্তমান
- আমার কাগজ ধরা
- বিচিত্র প্রবন্ধ
- ভাষা নিয়ে লেখা

রওশনারা বেগম, ৪, কাকলীবাগ, খুলনা কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবারুণ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত।

বিনিময় ঃ তিন টাকা

প্রকাশকাল—২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫